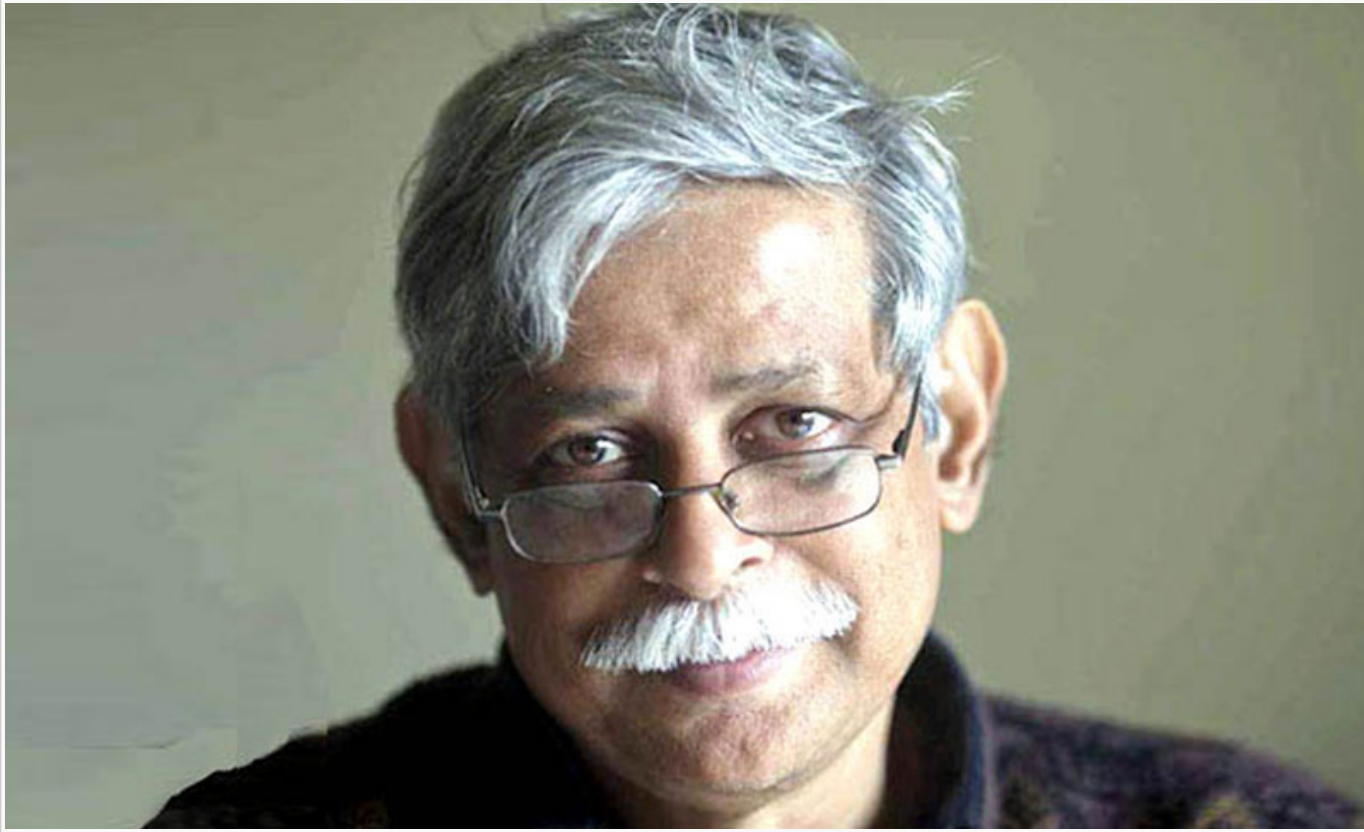


বিশ্ববিদ্যালয় র্যাংকিং : দেশের মানুষের চোখে

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

২৪ মে, ২০১৯ ০০:০০ | পড়া যাবে ১০ মিনিটে



আগেই বলে রাখছি আজকের লেখাটি পড়ে কারো কারো মন খারাপ হতে পারে। শুধু মন খারাপ নয়, কেউ কেউ বিরক্তও হতে পারেন এমনকি রাগও হতে পারেন। তবে আমি যেহেতু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় পদ্ধতির মাঝে প্রায় দুই যুগ কাটিয়ে দিয়েছি, তাই আমি অনেক কিছু বুঝতে পারি, যেটি হয়তো বাইরের একজন দেখেও বুঝতে পারবে না। তাই মাঝে মাঝে বিশ্ববিদ্যালয় পদ্ধতি নিয়ে কিছু একটা লেখার ইচ্ছা করে!

মনে আছে, বেশ কয়েক বছর আগে আমি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বলেছিলাম, আমাদের দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আসলে মৃত্যুপথযাত্রী, সেটা জেনে শুনেও আমরা তার হাত ধরে বসে ^r আছি, শুধু তার মৃত্যুবরণ একটুখানি কমানোর জন্য। আমি জানি এটি অত্যন্ত নিষ্ঠুর একটি বক্তব্য—অনেক দুঃখে এ রকম একটা বক্তব্য দিয়েছিলাম। তারপর অনেক বছর কেটে গেছে, আমি যদি এখন

নিজেকে সেই একই প্রশ্ন নিজেস করি, তাহলে আমি কী উত্তর দেব? পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ভয়ংকর দুঃসময় কি কেটে গেছে? এখন কি আমরা বলতে পারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সত্যিকারের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করেছে?

প্রথমেই দেখি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে বাইরের পৃথিবী কী বলে? কিছুদিন আগে অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিলাম, সেখানে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা আমাকে ভয়াবহ একটা তথ্য দিয়েছে। আমাদের দেশের দু-একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্নাতক ডিগ্রিটাকেও তারা স্বীকার করে না। সেটাকে একটা ডিপ্লোমার সমান ধরে নেয়। কী লজ্জার কথা। এই লজ্জার জন্য নিশ্চয়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক দায়ী না, এর জন্য দায়ী হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন! অস্ট্রেলিয়া থেকে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল, সেই তথ্য পাঠানো হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে আমরা কেউ একজন সেই তথ্য পাঠিয়ে দিলে হবে না। যাদের দায়িত্ব তাদের পাঠাতে হবে এবং শুধু একবার পাঠিয়ে নিশ্চিত হলে হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত বিষয়টি নিষ্পত্তি না হচ্ছে ততক্ষণ এর পেছনে লেগে থাকতে হবে। দরকার হলে অস্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশ হাইকমিশনকে এর জন্য একটু কাজ করতে অনুরোধ করতে হবে। সেগুলো করা হয়নি।



শুধু যে অস্ট্রেলিয়া আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে না তা নয়, সারা পৃথিবীর র্যাংকিংয়েও প্রথম কয়েক হাজারের মাঝে আমাদের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নেই। সেটা নিয়ে খুব হেঁচো হচ্ছে বলে শুনেছি। (আমাদের দেশে দুটি ভিন্ন জগৎ রয়েছে, একটি হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ার ভার্চুয়াল জগৎ আরেকটি হচ্ছে পত্রপত্রিকা ও টেলিভিশনের বাস্তব জগৎ। আমি সজ্ঞানে সিদ্ধান্ত নিয়ে ভার্চুয়াল জগৎ থেকে দূরে থাকি, তাই সেখানকার তাপ-উত্তাপ টের পাই না। সেই তাপ-উত্তাপের ছিটেফোঁটা যখন খবরের কাগজে এসে হাজির হয় তখন আমি সেটা জানতে পারি)। এবারও তাই, অনেক দিন পর যখন পরিচিত সাংবাদিকরা এ বিষয়ে আমার মতামত জানতে চাইতে শুরু করেছেন তখন আমি এই র্যাংকিং নিয়ে হেঁচোয় কথা জানতে পেরেছি।

১৬ কোটির দেশের সবচেয়ে ভালো ছেলে-মেয়েরা সারা পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো ছেলে-মেয়ে, শিক্ষকরা সারা

পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো শিক্ষক। কাজেই তারা যে ইউনিভার্সিটির ছাত্র ও শিক্ষক সেই ইউনিভার্সিটিগুলো পৃথিবীর প্রথম কয়েক হাজারের ভেতর নেই এই তথ্যটি কোনোভাবেই সঠিক তথ্য নয়। কিন্তু যেহেতু র‍্যাংকিংয়ে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, বুঝতে হবে কোথাও আমরা কিছু গোলমাল করেছি। অনুমান করছি কোনো একধরনের র‍্যাংকিংয়ে বিবেচিত হতে হলে যে প্রক্রিয়ায় সেই তথ্য পাঠাতে হয় আমরা নিশ্চয়ই সেভাবে সেই তথ্য পাঠাইনি। তাই আমরা বিবেচনার মাঝেই আসছি না! যেহেতু সারা দেশে এটা নিয়ে হেঁচকি হচ্ছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মুখ কাঁচুমাচু করে নানা রকম কৈফিয়ত দিয়ে যাচ্ছে, তাই আমি মনে করি এখন সময় হয়েছে আমাদের র‍্যাংকিংয়ে অবস্থানগুলো জানার। প্রতিবছর সারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা আন্তর্জাতিক প্রগ্রামিং প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। সেই প্রথম ১০০ থেকে ১৫০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে আমাদের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় নিয়মিতভাবে অংশ নিচ্ছে। কাজেই আমরা সারা পৃথিবীর মাঝে নিজেদের র‍্যাংকিং নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভুগব সেটা তো হতে পারে না!

তবে আমি খুব মজা পেতাম যদি দেখতাম আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বুক ফুলিয়ে বলত, ‘আমরা এই র‍্যাংকিংয়ের খোড়াই কেয়ার করি! আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অমুক অমুক গবেষক নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, প্রতিবছর এত হাজার পেপার প্রথম শ্রেণির জার্নালে প্রকাশিত হয়, এতগুলো পেটেন্ট ফাইল করা হয়। অমুক অমুক শিক্ষক আন্তর্জাতিকমানের। তাঁরা অমুক অমুক জার্নালের এডিটরিয়াল বোর্ডের সভাপতি, প্রতিবছর আমাদের এত হাজার পিএইচডি বের হয়, এতগুলো দেশ থেকে এতজন ছাত্র-ছাত্রী নিয়মিতভাবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এতগুলো হাইটেক কম্পানি স্পিন অফ করে বের হয়েছে, এখন তারা এত বিলিয়ন ডলারের কম্পানি, সেখানে এতজন গবেষক ইঞ্জিনিয়ার কাজ করেন ইত্যাদি ইত্যাদি।’ দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা এগুলো কিছুই বলতে পারছি না। তাই সোশ্যাল মিডিয়া এবং খবরের কাগজে গালমন্দ অপমান সহ্য করতে হচ্ছে। (আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সার্চ ইঞ্জিন-সংক্রান্ত একটি কম্পানি স্পিন অফ করে বের করার চেষ্টা করা হয়েছিল। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরাসরি না করে দিয়েছে। যখন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে তারা জানিয়েছে, আগে যেহেতু কখনো এ ধরনের কিছু করা হয়নি তাই তারা কিছুই বলতে পারছে না। যাঁরা জানেন না তাঁদের জন্য বলছি, গুগল হচ্ছে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে স্পিন অফ করা একটি কম্পানি। সারা পৃথিবীতে যেটাকে সাফল্য হিসেবে দেখা হয় আমাদের দেশে সেটাকে এখনো একটা দুই নম্বর কুমতলব হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কাজেই পৃথিবীর সমান সমান চিন্তাধারায় পৌঁছতে আমাদের আরো বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।) তারপর না হয় র‍্যাংকিং নিয়ে মাথা ঘামাব।

যা হোক, দেখাই যাচ্ছে বাইরের পৃথিবীর সামনে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ধর্তব্যের মাঝেই নেই, কিন্তু আমাদের নিজেদের মূল্যায়ন কী? একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বময় হর্তাকর্তা হচ্ছেন ভাইস চ্যান্সেলর। তাঁদের কী পরিমাণ ক্ষমতা সেটা বাইরের মানুষের পক্ষে কল্পনা করা পর্যন্ত সম্ভব নয়। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করার জন্য নানা ধরনের কমিটি থাকে কিন্তু ভাইস চ্যান্সেলররা চাইলে সেগুলো এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন যে সেই কমিটির কেউ মুখ পর্যন্ত খুলতে সাহস পাবেন না! যে একাডেমিক কাউন্সিল শেষ হতে রাত-দুপুর হয়ে যেত সেগুলো আধাঘণ্টায় শেষ হয়ে যায় সে রকম উদাহরণও আছে। যেহেতু একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালোমন্দ, লেখাপড়া, গবেষণা ভবিষ্যৎ একজন ভাইস চ্যান্সেলরের ওপর সাংঘাতিকভাবে নির্ভর করে, তাই মোটামুটি ঢালাওভাবে বলে দেওয়া যায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভাইস চ্যান্সেলরদের যদি ঠিকভাবে নিয়োগ দেওয়া হয় তাহলে সেগুলো ভালোভাবে চলবে। এখন প্রশ্ন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভাইস চ্যান্সেলরদের কি ঠিকভাবে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে?

আমি নিজের কানে শোনা দুজন ভাইস চ্যান্সেলরের দুটি উক্তির কথা বলি। একজন সরাসরি আমাকে বলেছেন, ‘যদি কোনো ভাইস চ্যান্সেলর দাবি করেন তিনি কোনো ধরনের লবিং না করে ভাইস চ্যান্সেলর হয়েছেন, তাহলে বুঝতে হবে হি ইজ এ ড্যাম লায়ার (সে হচ্ছে চরম মিথ্যাবাদী।)’ আরেকজন ভাইস চ্যান্সেলর দায়িত্ব নেওয়ার পর তাঁর আগের ভাইস চ্যান্সেলর সম্পর্কে বলেছেন, ‘তিনি এই

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কমপক্ষে ৩০ কোটি টাকা নিয়ে গেছেন!’ শুনে আমার চোখ কপালে উঠে গেছে।

কেউ যেন আমাকে ভুল না বোঝেন, আমি মোটেও দাবি করছি না আমাদের সব ভাইস চ্যান্সেলর এ রকম। কিন্তু আমি অবশ্যই যথেষ্ট ক্ষোভের সঙ্গে বলছি, যদি একজন ভাইস চ্যান্সেলর এ রকম হন আমি সেটাও মানতে রাজি নই। অন্য সব পেশার মানুষ এ রকম হতে পারে কিন্তু পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। তার সর্বময় দায়িত্বে যিনি থাকবেন তিনি এ রকম হতে পারবেন না।

আমি অবশ্য আমার জীবনে একজন অসাধারণ ভাইস চ্যান্সেলর পেয়েছিলাম। তিনি প্রফেসর মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান। একবার বিশ্ববিদ্যালয়ে গুণগামি করার কারণে ছাত্রলীগের ছেলেদের শাস্তি দেওয়ার অপরাধে তারা আমাকে ও তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অবাস্তিত ঘোষণা করেছিল। তিনি দেখতে ছোটখাটো কিন্তু দুঃসাহসী মানুষ ছিলেন। কখনো কোনো চাপের মুখে মাথা নোয়াতেন না। যা হোক, একবার কোনো একটি একাডেমিক কাউন্সিলে তাঁর সঙ্গে আমার তুমুল তর্কবিতর্ক ও ঝগড়া হলো (আমরা শিক্ষকরা একাডেমিক বিষয় নিয়ে অনেক ঝগড়াঝাঁটি করতাম)। একাডেমিক কাউন্সিল শেষ হওয়ার পর আমি বের হয়ে ফিরে যাচ্ছি, তখন বিএনপি-জামায়াতপন্থী একজন শিক্ষক আমার কাছে এসে গলা নামিয়ে বললেন, ‘আপনি চালিয়ে যান, আমরা আপনার সাথে আছি!’

আমি কয়েক সেকেন্ড তাঁর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। তারপর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ভাইস চ্যান্সেলর হাবিবুর রহমানের কাছে ফিরে এলাম। তাঁকে বললাম, ‘স্যার, আমি আপনার সাথে অনেক ঝগড়াঝাঁটি করেছি, ভবিষ্যতে মনে হয় আরো করব। কিন্তু স্যার আপনাকে বলতে এসেছি আমি আপনাকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করি। এই ঝগড়াঝাঁটি করি বলে কিন্তু মনে করবেন না আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা এতটুকু কমবে। আমি কী করব না করব সব আপনাকে দেখে ঠিক করি।’

প্রফেসর হাবিবুর রহমানের চোখ মুহূর্তের জন্য অশ্রুসজল হয়ে গিয়েছিল। আমার মনে হলো, ভাগ্যিস আমি তাঁর ভুল ভাঙাতে ফিরে এসেছিলাম। আমার বিশ্ববিদ্যালয়জীবন শেষ হয়ে গেছে, এ রকম অনেক মিষ্টিমধুর স্মৃতি নিয়ে পরের জীবনে ফিরে যাব, চিন্তা করেই ভালো লাগে।

যা হোক, আন্তর্জাতিকভাবে র‍্যাংকিংয়ে বিবেচিত হওয়ার আগে আমরা কি জিজ্ঞেস করতে পারি দেশের সাধারণ মানুষ তাদের কিভাবে র‍্যাংকিং করবে? প্রতিবছর ভর্তি পরীক্ষার সময় এ দেশের বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের এবং তাদের অভিভাবকদের কী পরিমাণ কষ্ট করতে হয় সেটা জানতে দেশের কোনো মানুষের বাকি নেই। এই কষ্টটুকু শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রশাসকরা জানতে পারেননি কিংবা জানতে পারলেও অনুভব করতে পারেননি। আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত ছেলে-মেয়েদের এই কষ্টটুকু বুঝতে পেরেছেন এবং অনেকবার সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে তাদের কষ্টটুকু লাঘব করার কথা বলেছেন। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাঁর কথায় কর্ণপাত করেননি। কাজেই এ দেশের ছেলে-মেয়ে এবং তাদের অভিভাবকদের বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিংয়ের দায়িত্ব দেওয়া হলে তারা যে র‍্যাংকিংকে খুব উঁচু স্থান দেবে সেটি মনে হয় না।

২.

এতক্ষণ পর্যন্ত ক্রমাগত নেতিবাচক কথা বলে এসেছি, কিন্তু এ রকম মন খারাপ করা কথা বলে লেখাটা শেষ করতে মন চাইছে না। কোনো একটা ভালো কথা বলে লেখাটা শেষ করতে চাই।

কয়েক দিন আগে খবরের কাগজে দেখেছি আমাদের দেশের আটটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় মিলে সম্মিলিতভাবে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খবরটি পড়ে আমার বুক আনন্দে ভরে গেছে। মনে হয়েছে এ দেশে অন্তত আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আটজন ভাইস চ্যান্সেলর আছেন, যাঁরা তাঁদের শিক্ষকদের নিয়ে এই অসাধারণ কাজটি করতে রাজি হয়েছেন। এই ভাইস চ্যান্সেলর, শিক্ষক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দেশের সাধারণ ছেলে-মেয়েদের জন্য ভালোবাসা রয়েছে। কী চমৎকার একটি ব্যাপার।

আমি কিভাবে তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতাটুকু প্রকাশ করব বুঝতে পারছি না। যদি সামনাসামনি গিয়ে প্রকাশ করার সুযোগ কখনো নাও পাই তার পরও তাঁদের জন্য রইল আন্তরিক ভালোবাসা। শুধু আমার নয়, এ দেশের লাখ লাখ ছেলে-মেয়ে ও তাদের অভিভাবকদের কৃতজ্ঞতাটুকু নিশ্চয়ই তাঁরা অনুভব করবেন।

আমাদের শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, তিনি সব বিশ্ববিদ্যালয় মিলে সমন্বিত একটি ভর্তি পরীক্ষা দেখতে চান। আমরা সবাই জানি আগে হোক পরে হোক সবাইকেই এই পথে আসতে হবে, কিন্তু সবার আগে পথপ্রদর্শনের এই সম্মানটুকু বাংলাদেশের আটটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যই থেকে যাবে।

দেশের মানুষের র্যাংকিংয়ে তাঁরা এখন সবার ওপরে।

লেখক : কথাসাহিত্যিক। সাবেক অধ্যাপক শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট